সমুদ্রা ইস্তাহার
পরিবেশ নিয়ে ভাবনা
সমুদ্রের অভিধান

বর্ষ : ৩ সংখ্যা ৮ মার্চ-জুন, ২০১১ দাম ২ টাকা

ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য - এক নিঃশব্দ ঘাতক

বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়

১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি কোনও এক সময়ে, আমার পরম শ্রদ্ধেয় বিশিষ্ট অধ্যাপক শ্রী প্রফুল্ল চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়ির আমগাছের তলায় বসে বিভিন্ন আলোচনা প্রসঙ্গে মাষ্টারমশাই বলেছিলেন অদূর ভবিষ্যতে কম্পিউটার ও মাইক্রোচিপ পৃথিবীতে এক বিপ্লব আনতে চলেছে। তখন বুঝতে পারিনি এর মর্মার্থ। গ্যাট চুক্তির হাত ধরে ১৯৯০ সালে শুরু হল এক নতুন বিশ্বায়ন — ইলেক্ট্রনিক্স জগতে এল বৈপ্লবিক পরিবর্তন। তখন বুঝতে পারলাম বেশ কয়েক বছর আগে বলা মাষ্টারমশাই-এর কথার মর্মার্থ। প্রায় প্রতিটি অফিসে, বাড়িতে কম্পিউটার— ক্রমশই বাড়তে লাগল কম্পিউটারের ব্যবহার। বুঝতে পারলাম কম্পিউটার ও মাইক্রোচিপ মানুষের জীবন দর্শন অনেকটাই পাল্টে দিচ্ছে। কিন্তু একটা বিষয়ে মানুষ সেই সময় খুব একটা চিন্তা-ভাবনা করেনি - সেটা হল কম্পিউটার এবং মাইক্রোচিপ সংক্রান্ত বর্জ্যের (E-Waste) সঠিক এবং নিরাপদ ব্যবস্থাপন। পৃথিবীতে ক্রমশই বাড়তে থাকল কম্পিউটার এবং মাক্রোচিপ সংক্রান্ত বর্জ্যের পরিমাণ যা আজ হয়ে উঠেছে প্রায় অনিয়ন্ত্রিত এক গরল।

আধুনিক যুগের এক আশীর্বাদ কম্পিউটার - আমাদের জীবনকে যা অনেক সহজ করে তুলেছে। এই উন্নত প্রযুক্তি আমাদের নানা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। অনেক কিছু জানার সুযোগ দিচ্ছে। কাজের উৎকর্ষ এবং পরিমাণ উন্নত করেছে। দ্রুতগামী ইন্টারনেটের সুবাদে চাবি টিপলেই পৃথিবী এখন দোরগোড়ায়। কিন্তু আধুনিক পৃথিবীর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রটি একদিকে তৈরি হচ্ছে বেশ কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়ে, অন্যদিকে যন্ত্রগুলি কিছুদিনের মধ্যেই ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে।

কম্পিউটার হল নানা উপাদানের এক জটিল সন্নিবেশ। কাঁচা মাল এবং প্রচুর পরিমাণ শক্তি খরচ করে বানানো এই উপাদানগুলির বেশ কয়েকটির রয়েছে পরিবেশ দূষণ তৈরির ক্ষমতা। কম্পিউটারের এই জীবন-চক্রের দিকে নজর দিলে বোঝা যাবে পরিবেশে তার কী প্রভাব পড়ছে। উদাহরণ স্বরূপ 32MB RAM একটি 'মেমারি চিপ' উৎপাদন প্রক্রিয়ার এক সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে যে কমপক্ষে ১২০০ গ্রাম জীবাশ্ম জ্বালানি এবং ৭২ গ্রাম নানা ধরনের রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োজন হয় একটি ২ গ্রাম-এর 'মেমারি চিপ' তৈরি করতে। এ থেকেই বোঝা যায় এর ক্ষুদ্র আকারের তুলনায় এগুলি তৈরি করতে কত বিপুল পরিমাণ পরিবেশ-প্রতিকূল উপাদান ব্যবহৃত হয়। এর ওজনের তুলনায় অন্তত ৬০০ গুণ বেশি জীবাশ্ম জ্বালানি খরচ করা হয়।

ভারতে এমনিতে চাহিদার তুলনায় শক্তির জোগান বেশ কম। বিদ্যুতের চাহিদা, জোগানের তুলনায় ৭০,০০০ মেগাওয়াট বেশি। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, গ্রাহক এবং আই টি সহ বড় কর্পোরেট সংস্থা তাদের কম্পিউটার চালু রাখতে ডিজেল জেনারেটার ব্যবহার করছে। এতে স্বভাবতই ব্যয় অনেক বেশি এবং অফিস চালানোর খরচ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বেড়ে যাচ্ছে। আবহাওয়া পরিবর্তন এবং শক্তি সংরক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে কম্পিউটারকে 'শক্তিদক্ষ' করে তোলা অর্থাৎ যথাসম্ভব কম বিদ্যুৎ ও শক্তি খরচ করে চালানো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠছে। বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে ভারতের বিভিন্ন সংস্থায় 'শক্তিদক্ষ' কম্পিউটারের বিষয়ে সচেতনতা ও চাহিদা ক্রমশই বেড়ে চলেছে।

সিসা, পারদ, বেরিলিয়াম ও অগ্নি-নিরোধক জাতীয় বিষাক্ত পদার্থের ব্যবহারের বিষয়টি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কম্পিউটার ব্যবহারের সময় তেজস্ক্রিয়তা বিকিরণ বা বিষ নির্গমনের বিষয়ে বিতর্ক থাকলেও রিসাইক্লিং প্রক্রিয়ায় বিপদ নিয়ে সবাই একমত। যে বিপুল পরিমাণ আবর্জনা তৈরি হচ্ছে তার ব্যবস্থাপনা নিয়ে উদ্বেগ তো আছেই। তবে শুধু তা বিপুল পরিমাণের জন্য নয় — নানা ধরনের বিপজ্জনক পদার্থের ব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর তার প্রভাব সম্পর্কেও। এর সমাধান করতে হলে আমাদের কেবল কম্পিউটার রিসাইক্লিং করা, উন্নত করা বা টেকশই করার উপর জোর দিলে চলবে না, কীভাবে এই বিপজ্জনক উপাদানগুলি কমানো যায় তা-ও গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে।

এর পর দুইয়ের পাতায়

একের পাতার পর

কম্পিউটার ও তার আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিতে থাকে কয়েকশো পদার্থের জটিল সংমিশ্রণ। এর মধ্যে অনেকগুলিই বিপজ্জনক প্রকৃতির। সিসা, পারদ, ক্যাডমিয়াম, হেক্সাভ্যালেন্ট ক্রোমিয়াম, বেরিলিয়াম, ব্রোমিনেটেড অগ্নি নিরোধক, পি ভি সি প্রভৃতি এগুলির কয়েকটি। এই বিপজ্জনক পদার্থগুলি তাদের সম্পূর্ণ জীবনচক্রে, উৎপাদন থেকে বর্জন পর্যন্ত গুরুতর দূষণ সৃষ্টি করে। আরও গুরুত্বপূর্ণ হল কম্পিউটার হার্ডওয়্যার বর্জ্য যদি দায়িত্ব সহকারে ব্যবস্থাপন না করা যায়, তাহলে এই বিষাক্ত পদার্থগুলি শেষ পর্যন্ত জীবমণ্ডলে ঢুকে পড়ে। যখন কোন কম্পিউটার বা ল্যাপটপের কার্যকারিতা শেষ হয়, এগুলিকে বর্জ্য হিসাবে ফেলে দেওয়া হয়। তারপর সেগুলো শহরের কোন গলিতে আদিম উপায়ে রিসাইক্লিং করার ব্যবস্থা করা হয়। দেখা যায় নারী ও শিশুসহ একদল মানুষ খালি হাতে এগুলি খুলছে, ভিতরের বিষাক্ত পদার্থগুলি অ্যাসিডে গলাচ্ছে যাতে ন্যূনতম পরিমাণ ভারি ধাতুগুলিও আহরণ করা যায়। এইরকম পিছিয়ে পড়া, অসংগঠিত রিসাইক্লিং প্রক্রিয়ায়, এর সঙ্গে যুক্ত সবাই বিশেষত নারী ও শিশুরা অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ইলেকট্রিকাল এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিকে আরও সবুজ বা পরিবেশ অনুযোগী করে তুলতে কিছু আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দুটি উদ্যোগ ইউরোপিয়ান RoHS এবং চিন RoHS সারা পৃথিবীতে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে।

ইউরোপিয়ান RoHS

ইলেকট্রিকাল এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে কয়েকটি বিপজ্জনক পদার্থ ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা (Directive on the Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment), ২০০২/৯৫/ই সি ফেব্রুয়ারি ২০০৩-এ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে গৃহীত হয়। এই নির্দেশিকাকেই সংক্ষেপে RoHS বলা হয়। ১জুলাই, ২০০৬ থেকে এই নির্দেশিকা কার্যকর হলে কম্পিউটার সহ বৈদ্যুতিক ও বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতিতে ছয় ধরনের বিপজ্জনক পদার্থ ব্যবহার বন্ধ করা হয়। পৃথিবীতে যদিও ইকো ফ্রেন্ডলি কম্পিউটার তৈরির উদ্যোগ বাড়ছে, ভারতে এইসব বিপজ্জনক পদার্থ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন আইনি সুরক্ষা নেই। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ অবশ্য 'পরিবেশ অনুযোগী ইলেকট্রনিক বর্জ্যের যথাযথ ব্যবস্থাপনার নির্দেশিকা' (Guidelines for Environmentally Sound Management of Electronic Waste) প্রকাশ করে ভারতে RoHS ধরনের আইনি ব্যবস্থা চালু করার প্রস্তাব দিয়েছে। RoHS-কে অনেক সময় 'সিসা মুক্তকরণ নির্দেশিকা' (Lead-free directive) বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে ছয়টি বিপজ্জনক পদার্থ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রয়েছে এই RoHS-এ।

- সীসা
- পারদ
- ক্যাডমিয়াম
- পলিব্রোমিনেটেড বাইফিনাইল (পি বি বি)
- হেক্সাভ্যালেন্ট ক্রোমিয়াম
- পলিব্রোমিনেটেড ডাইফিনাইল ইথার (পি বি ডি ই)

ক্যাডমিয়াম ছাড়া অন্যান্য বিপজ্জনক পদার্থের সমস্বত্ত্ব (homogeneous) ধাতুর জন্য ওজনের ভিত্তিতে ঘনত্বের সর্বোচ্চ সীমা অনুমোদন করা হয়েছে, ০.১% অথবা ১০০০ পার্টস পার মিলিয়ন (ppm)। ক্যাডমিয়ামের ক্ষেত্রে তা ০.০১% অথবা ১০০ পার্টস পার মিলিয়ন (ppm)। এই সীমা শুধু সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়া পণ্য বা একটি যন্ত্রাংশ নয়, বরং যে কোন একটি নির্দিষ্ট পদার্থ যা কম্পিউটার থেকে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পৃথক করা যায় (তাত্ত্বিক ভাবে হলেও) সে ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

চিন RoHS

দূষণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি চালু করার জন্য যা বিপলস রিপাবলিক অব চায়না ম্যানেজমেন্ট মেথড ফর কন্ট্রোলিং পলিউশন বাই ইলেকট্রিক ইনফরমেশন প্রোডাক্টস, শিল্প তথ্য মন্ত্রক (Ministry of Information Industry) অর্ডার - ৩৯ এবং ইন্ডাস্ট্রি এসেন্স ক্লাস টি ১১৩৬৪ - ২০০৬ বৈদ্যুতিন তথ্য যন্ত্রপাতি - যাকে চিন RoHS বলা হয় - তা ২০০৭ সালের ১ মার্চ থেকে কার্যকর হয়েছে।

ইউরোপিয়ান আইনগুলির মূল বিষয়গুলি যেমন নিয়ন্ত্রিত পদার্থগুলির সর্বোচ্চ মাত্রা চিন RoHS একই আছে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য:

- মোড়ক বা প্যাকেজিং অবশ্যই বিষাক্ত নয় এমন বায়োডিগ্রেডেবল অথবা রিসাইক্লিং করা যায় এমন উপাদান দিয়ে তৈরি হবে।
- প্যাকেজিং-এ অবশ্যই পণ্যের উপাদানগুলির উল্লেখ থাকবে।
- বিপজ্জনক পদার্থের নাম, পরিমাণ এবং কতটা ও কেমনভাবে রিসাইক্লিং হবে তার উল্লেখ থাকবে

পৃথিবীর অনেক উৎপাদকই এই আইনি ব্যবস্থাগুলির প্রয়োজনীয়তা মেনে পদক্ষেপ নিচ্ছে। ভারতীয় উৎপাদকদের উপরেও এর প্রভাব পড়ছে। বেশির ভাগ উৎপাদক কোম্পানি এখন RoHS স্বীকৃত পণ্য তৈরি করছে। TBBPA (টেট্রা-ব্রোমোবিসফেনল) অগ্নি নিরোধক হিসাবে সার্কিট বোর্ড এবং কম্পিউটার কেসিং-এ ব্যাপক হারে (৯৫%) ব্যবহার হয়। বেশির ভাগ কোম্পানি এই অগ্নি নিরোধক এবং পি ভি সি ব্যবহার ধাপে ধাপে কিছু দিনের মধ্যেই বন্ধ করবার পরিকল্পনা করেছে। চিহ্নকরণ (লেবেলিং)-এর ব্যবস্থা যন্ত্রাংশের ক্ষেত্রেও চালু হয়েছে।

যদিও কার্যকারিতা শেষে কম্পিউটারের রিসাইক্লিং যোগ্যতা, সিসা যুক্ত সোল্ডার-এর মত বিপজ্জনক পদার্থের ব্যবহার কমানো নিয়ে নানা আলোচনা হয়, পরিবেশে কম্পিউটারের প্রভাব কতটা

এর পর ছিতের পাতায়

দুয়ের পাতার পর

পড়ছে তা বোঝার জন্য কম্পিউটারের জন্য কতটা শক্তি খরচ হচ্ছে তা-ও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়।

গত দু'দশকে কম্পিউটারের শক্তির প্রয়োজনীয়তা বহুলাংশে কমে গেছে। গবেষণার ফলে এমন শক্তি-দক্ষ-কম্পিউটার এবং মনিটার তৈরি করা গেছে যাতে শক্তির প্রয়োজনীয়তা এখন অনেক কম। অন্যদিকে আবার বেশি প্রসেসিং ক্ষমতা সম্পন্ন কম্পিউটার এবং উচ্চ রেজোলিউশনের মনিটর চালু হওয়ায় শক্তি চাহিদা বেড়ে গেছে। ফলে নতুন কম্পিউটার এবং মনিটরগুলি কাজ চালু থাকার সময় আরও বেশি শক্তি খরচ করছে, তবে সেগুলি লো-পাওয়ার মোডে থাকার সময় পুরানো কম্পিউটার এবং মনিটরগুলির তুলনায় অনেক কম শক্তি খরচ করছে।

কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে শক্তি ব্যবস্থাপন করা ও শক্তির খরচ কমাতে অনেক সাহায্য করে। বেশ কিছু সমীক্ষায় এর প্রমাণ মিলেছে। শক্তি ব্যবস্থাপন যন্ত্র এখন কম্পিউটারে সাধারণ ভাবে লাগানো হচ্ছে, ফলে শক্তি খরচ বেশ কিছুটা কমানো যাচ্ছে।

পরিবেশ-অনুকূল নকশা তৈরি

Design for Environment (DfE) হল কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ নির্মাতার উদ্যোগ বিপজ্জনক পদার্থ ব্যবহার বন্ধ করে ছাড়াও এই উদ্যোগের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল :

- সহজে চিহ্নিত করা যায় এমন সব পদার্থের ব্যবহার
- ব্যবহৃত সামগ্রীকে কাঁচা মাল (Secondary Raw Materials) হিসাবে ব্যবহার।
- যন্ত্রাংশের সংখ্যা কমানো।
- প্রাকৃতিক সম্পদের কম ব্যবহার।
- সহজে খোলা এবং আলাদা করা যায় এমনভাবে বানানো।
- স্বীকৃত নকশা করা যন্ত্রাংশের ব্যবহার।
- পণ্যের জীবন সীমা বাড়িয়ে টেকসই করা।
- প্যাকেজিং কমানো এবং প্যাকেজিং-এ পরিবেশ-অনুকূল দ্রব্যের ব্যবহার।

দ্রব্যের ব্যবহার এবং রিসাইকল্ যোগ্যতা নিয়ে পৃথিবীতে কিছু কাজ হয়েছে। কিন্তু সবুজ বা পরিবেশ অনুকূল কম্পিউটার পেতে হলে এখনও অনেক দূর যেতে হবে।

পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে চেতনা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার কমে যাওয়া সম্পর্কে এখন পণ্য তৈরির নকশায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। বহু পণ্য এখন উদ্ভাবন করা হচ্ছে পরিবেশে তার সম্পূর্ণ জীবনচক্রের প্রভাব মনে রেখে। এগুলিকেই বলা হচ্ছে 'সবুজ পণ্য'।

সরকারি আইনের চাপ এবং গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদকের সবুজ উপাদানের চাহিদা এই ধরনের পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করবে, নতুন পণ্যগুলিকে আরও জনপ্রিয় করে তুলবে আগামী প্রজন্মের স্বার্থে।

স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ তথা বনাঞ্চল : কয়েকটি বিষয়ে আলোকপাত

বেবি বসু (গুপ্ত)

সবুজ বৈচিত্র্যে ভরা স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ পৃথিবীর এক বিরাট সম্পদ। কোনও স্থানের জলবায়ু, ভূমিরূপ ও মৃত্তিকাই স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের প্রধান নিয়ন্ত্রক। পৃথিবীর বুকে বিকশিত প্রথম প্রাণময়তা বৃক্ষকুলের মধ্যেই সঞ্চিত ছিল যা নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশের মধ্য দিয়ে ধরণী হয়ে উঠেছিল শ্যামল-স্নিগ্ধ ও পরবর্তী প্রাণীকুলের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের যোগানদার। মানব সভ্যতা বিকাশের প্রতি পর্যায়ে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের সীমা সংক্ষিপ্ত হতে থাকে কখনও কৃষি ক্ষেত্রের বিস্তার, কখনও শিল্প-পরিবহন-নগরায়ন প্রভৃতি নানা রূপে মানুষের প্রয়োজনে — যা আজও অব্যাহত গতিতে সংকুচিত হয়ে চলেছে। প্রকৃতি প্রেমিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'আরণ্যক' উপন্যাস তারই ক্ষুদ্র পটচিত্র — যেখানে লবটুলিয়া বইহারের নিবিড় অরণ্যানীর প্রকৃতিগত মনোমুগ্ধকর রূপ-রস-গন্ধ ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে থাকে কর্মযোগ্য শস্যক্ষেতে প্রস্তুতির আকাঙ্ক্ষায়। এভাবেই হাজার হাজার বছর ধরে সবল-বংশের পথ বিস্তৃত হয়েছে।

কিন্তু সহনশীল প্রকৃতি একসময় নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। গাছপালার অন্তরালে দেখা দেয় নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়। জলবায়ু পরিবর্তন, উষ্ণায়ন, জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্যহীনতা, জলচক্র, নাইট্রোজেন চক্র, অক্সিজেন-কার্বনডাইঅক্সাইড ভারসাম্য — সবই হতে থাকে বিঘ্নিত। তাই সচেতন মানুষ আবার আন্দোলন করে — 'গাছ বাঁচাও।'

সমগ্র পৃথিবীর ভূমিরূপ, জলবায়ু ও মৃত্তিকার বৈচিত্র্যের উপর ভিত্তি করে স্বাভাবিক ভাবে মানুষের হস্তক্ষেপ ব্যতীত যে বৃক্ষাদি জন্মায় তার মূল্য অপরিসীম। বৃক্ষ-বৈচিত্র্যের তাই কতগুলি শ্রেণিবিভাগ দেখা যায় যাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয় 'জৈবাঞ্চল'(Biomes)। এদের মধ্যে নিবিড় বনজ সম্পদ সৃষ্টিকারী প্রধান দুটি জৈবাঞ্চল কাষ্ঠল গোষ্ঠীভুক্ত (Woody Trees), যথা - নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের 'বৃষ্টি-অরণ্য'(Rainforest) — যা চিরহরিৎ, যা পাঁচটি ধাপে ভূমি থেকে উন্নত স্তরে বিন্যস্ত থাকে। আমাজন নদী অববাহিকায় যা 'সেলভা' নামে পরিচিত। সমগ্র পৃথিবীতে এই বৃষ্টি অরণ্য এ নামেই চিহ্নিত হয়েছে। এই বৃষ্টি অরণ্যই নিরক্ষরেখার উত্তর ও দক্ষিণে ক্রান্তীয় অঞ্চলে বিস্তৃত হয়ে মৌসুমি বলয়ে ক্রান্তীয় পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি। সুতরাং পৃথিবীর উষ্ণ বলয়টি বৃক্ষ প্রজাতির উপযুক্ত আবাসস্থল। পৃথিবীর মোট সাড়ে তিন লক্ষ বৃক্ষ প্রজাতির মধ্যে আমাজন নদীর সেলভা বনভূমিতে দেখা যায় প্রায় অর্ধ লক্ষ প্রজাতির একত্র বসবাস। দ্বিতীয় বনজ সম্পদ বলয়টি হল শীতল নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের চিরহরিৎ সরলবর্গীয় বা মোচাকৃতি (Coniferous) বনাঞ্চল। পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে যার বিস্তার প্রায় ৫৫°

এর পর চারের পাতায়

বিগত পাতার পর

উ. থেকে ৭০° উ. অক্ষাংশের মধ্যে এক সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত বলয়ের আকারে রয়েছে। সাইবেরিয়া অঞ্চলে যা 'তাইগা' (Taiga) নামে চিহ্নিত — সেই কারণে সমগ্র পৃথিবীতে এই প্রজাতির অর্থাৎ এই জাতীয় উদ্ভিজ্জের এই বিশেষ অক্ষাংশগত অবস্থানকে 'তাইগা বা বোরিয়াল'(Taiga or Boreal) বলা হয় — কারণ দক্ষিণ গোলার্ধে এর অবস্থান অক্ষাংশগত ভাবে ভূমি ভাগ না থাকায়, সেখা হয় না কী তাইগা বা কী সেলভা বনভূমি পৃথিবীর বনসম্পদের নিরিখে সর্বাধিক মূল্যবান যা 'অরণ্য জৈবাঞ্চল'(Forest Biochore) নামে একই গোষ্ঠীভুক্ত। এর মধ্যে সেলভা বনভূমির ঔদ্ভিদচিত্র সর্বজনবিদিত। অক্ষাংশগত ভাবে ও জলবায়ুগত পার্থক্যের ভিত্তিতে এই বিশাল অরণ্য জৈবাঞ্চলের মধ্যবর্তী বলয়ে রয়েছে সাভানা জৈবাঞ্চল (Savanna Biomes), তৃণভূমি জৈবাঞ্চল (Grassland Biomes) ও মরু জৈবাঞ্চল (Desert Biomes) — যা বনভূমির অন্তর্গত।

সমগ্র পৃথিবীর অর্থনীতিতে প্রগতির কারণে এই বনভূমির সুরক্ষা যতটা প্রয়োজন আবার এই কারণেই এই বনভূমি ধ্বংসেরও শিকার হচ্ছে। প্রথমত, পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলির ভূমিগত আয়তন কম হওয়ায় সেখানে কৃষিকাজ, পশুপালন ও শিল্প বিস্তারের যত অগ্রগতি ঘটেছে ততই তার বনভূমি সংকুচিত হয়েছে। উদাহরণ - জার্মানির রাইন নদীর উপনদীর উপর গড়ে ওঠা রুঢ় শিল্পাঞ্চল বিশ্বে এক বিশেষ উন্নত শিল্পাঞ্চল যা পশ্চিম ইওরোপের গর্ব — তাই তাদের সেখানকার দ্রুত পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমির অবলুপ্তির প্রধান কারণ। একইভাবে উত্তর আমেরিকার হ্রদ শিল্পাঞ্চল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বনভূমি নিধনের কারণ। পৃথিবীর সর্বত্রই কৃষি-শিল্প-পরিবহন-নগরায়ণের কুফল হল বনভূমির সংকোচন। ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম নয়। ভারত ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলির অনুন্নত কৃষি বা পরিযায়ী কৃষি কাজ (Slash and burn process) বনভূমি বিনাশের আরেক উপদ্রব। সমগ্র বিশ্বে বনসংরক্ষণের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, কোনও রাষ্ট্রের ভূমির আয়তনের অন্তত তিন ভাগের এক ভাগ স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ দ্বারা আবৃত বনভূমি হলে প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা, দূষণ-মুক্তি প্রভৃতি ঘটাতে সক্ষম। দুঃখের বিষয় যে, ভারতের উত্তর ভাগে সুবিস্তৃত হিমালয়েও বৈচিত্র্যময় বনভূমি বলয়, তরাই-ডুয়ার্সের নিবিড় অরণ্য, মধ্য-দক্ষিণ ও পূর্ব ভাগের ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য, পর্ণমোচী বৃক্ষ সমারোহ, ম্যানগ্রোভ অরণ্য থাকা সত্ত্বেও বর্তমান ভারতে তার সমগ্র ভূমিভাগের মাত্র কুড়ি শতাংশে বনজ সম্পদে চিহ্নিত।

সুতরাং বনভূমি বাঁচিয়ে রাখা ও গড়ে তোলা —সুতরাং এই বনভূমির আয়তন বাড়ানো বাস্তব হতে পারে। এর জন্য প্রয়োজনীয় আইনের সুরক্ষা ও মানুষের জীবনধারা অনুশাসন ও বৈজ্ঞানিক চেতনা-সমৃদ্ধ সচিক্ষার দরকার। বনভূমি, যা বর্তমানে রয়েছে, তার সুরক্ষার নিমিত্ত যথাযোগ্য নীতি নির্ধারণ ও কার্যকরী রক্ষণাবেক্ষণ (Regular Vigilance) আবশ্যক। এর পাশাপাশি বনসৃজন আরেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজনে বনসৃজন একটি উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার — যাকে সামাজিক বনসৃজন (Social Forestry) বলা হয়। কৃষিকাজের নিমিত্ত ভূমিভাগ যেমন খাদ্যের জোগান দেয় তেমনি বনসৃজনের মাধ্যমেই যখন নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ফেরে তখন সেই বনভূমি বিনষ্ট করার মনোভাবটিই দূরীভূত হবে। সেই ক্ষেত্রে যে অঞ্চলে যে ধরনের বৃক্ষটি বনজ ফসল প্রদানে সক্ষম সেই অঞ্চলে সেই ধরনের বনভূমি নূতন করে গড়ে তোলার বিস্তার, বৃষ্টি ও সেই অঞ্চলের মানুষের আয় বৃদ্ধি ঘটাবে। ভারতের উদাহরণ দিয়ে বলা যায় নানা ফলের বাগান, ওষধি বৃক্ষলতা বৃদ্ধির জন্য বনসৃজন করা হচ্ছে। বন্যপ্রাণী সুরক্ষা, পাখীরালয় — সবই এক ছাতার তলায় গড়ে উঠতে পারে। অতীতে মুনি-ঋষিগণ বনের ফলমূল খেয়ে দীর্ঘ জীবন লাভ করতেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই বনসৃজন করলে ১২১ কোটি জনসংখ্যার ভারতেও নব দিগন্তের উন্মেষ ঘটতে পারে।

আঞ্চলিক মঙ্গল ছাড়াও বন সুরক্ষা ও বনসৃজন প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটি বোঝাপড়ার পথ দেখাতে পারে। ভারতের উত্তর-পশ্চিম-পূর্বে সুবিস্তৃত আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে হিমালয় ও ভিন্নধর্মী পর্বতাঞ্চলে সমৃদ্ধ নেপালের বিশাল বনভূমি। এই বনভূমি সুরক্ষা ও বৃদ্ধির নিমিত্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সন্ধির মাধ্যমে কঠোর ও সুনিশ্চিত করা সরকার বনভূমির অবক্ষয় এই বিশাল ভারতীয় উপমহাদেশের মৌসুমি বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা-খরা-বন্যা ঘটায় বা এর অন্তর্ভুক্ত সকল কৃষিভিত্তিক দেশগুলিকে কীভাবে বিপন্ন করে তা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। সুতরাং পৃথিবীর সর্বত্র যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র —কানাডা সীমানায় বিস্তৃত সরলবর্গীয় বনভূমি, নরওয়ে-সুইডেন-ফিনল্যান্ড-রাশিয়ার তাইগা বনভূমি, ভারতীয় উপমহাদেশের হিমালয় পার্বতের বনভূমি ও সানুদেশের তরাই-ডুয়ার্স, দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন-ওরিনোকো নদী অববাহিকা, আফ্রিকার কঙ্গো অববাহিকায় মালয়েশিয়া-ইন্দোনেশিয়া-ফিলিপিন্সের বিস্তৃত অঞ্চলের বনভূমি সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক চুক্তি ও দায়বদ্ধতার পরিবর্তন ও পরিমার্জন বাঞ্ছনীয়। পৃথিবীর সর্বত্র বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি সমগ্র মানবসম্প্রদায়ের পক্ষে কল্যাণকর। সুতরাং এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যেমন পরিবেশ সুরক্ষা ও মানুষের স্বাস্থ্য-সামাজিক মঙ্গলের জন্য জোর কদমে বনসৃজনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল তেমনি বর্তমান সময়ে যে ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত হয় সেখানে বনসুরক্ষা, বনসৃজন এবং সিলভিকালচার (Silviculture) মুখ্য পদক্ষেপ বলে সর্বস্তরে সর্বসম্মত গৃহীত হয়। বনাঞ্চল সংরক্ষণ ও বনায়তন বৃদ্ধি একদিকে জাতীয় সম্পদ, অপরদিকে যা আন্তর্জাতিক স্তরে চুক্তিবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করলেই গুরুত্বপূর্ণ স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ বলয়গুলি ঘিরে পরিকল্পিত সফলতা এনে দিতে পারে। এ পথেই পৃথিবীর পরিবেশ সুরক্ষায় বনাঞ্চল আরও গুরুত্ব পাবে কৃষি, শিল্প, নগরায়ণের উন্নতি অব্যাহত রেখেও। কারণ সভ্যতার

এর পর পাঁচের পাতায়

অরণ্যভূমি ও বনাঞ্চলের সুরক্ষা — এ দুয়ের সহাবস্থানই হল পরিবেশ, মানব সমাজ তথা জীব জগতের পক্ষে মঙ্গলজনক।

পরিবেশ রক্ষায় নারীর ভূমিকা

রেখা দাঁ

আজ থেকে প্রায় ৪৬০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর অস্তিত্বের গোড়ার দিকেই শুরু হয়েছিল পরিবেশের নানা পরিবর্তন। এই পরিবর্তন সমগ্র বিশ্বের বায়ুমণ্ডল, বারিমণ্ডল, মৃত্তিকামণ্ডল এবং জীবমণ্ডলে ধারাবাহিক ভাবে সূচনা হয়েছে। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই পরিবর্তনের কারণ হিসাবে দেখা দিয়েছে প্রাকৃতিক শক্তি যেমন আগ্নেয়গিরি, ভূমিকম্প, ঝঞ্ঝা, বন্যা, জল, উদ্ভিদ এবং প্রাণী। এরা সকলেই পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ সম্পর্কে যুক্ত হয়ে সৃষ্টি করেছে গতিময় বাস্তুতন্ত্র যেখানে স্বাভাবিক ভাবে একে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং নিয়ন্ত্রিত হবে। বর্তমান বিশ্বের প্রাণীজগতের শ্রেষ্ঠ মনুষ্যজাতি পরিবেশ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসে হয়ে ওঠে অতি শক্তিধর। জন্মলগ্নের উষাকাল থেকে আজকের মহাকাশ যুগের মানুষ প্রগতির আধুনিকতম পর্যায়ে তৌল পরিবেশের সঙ্গে ক্রমাগত ক্রিয়া-বিক্রিয়া করে চলেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানা কৃৎকৌশল নিয়ে বিরাট সংখ্যক মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে প্রকৃতি-পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করে প্রাকৃতিক-পরিবেশকে পরিবর্তন করেছে। তৈরি হয়েছে মেগা সিটি, জনবসতির নানা-শহর যা প্রাকৃতিক পরিবেশকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করেছে। পৃথিবীর জনসংখ্যা অত্যধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বেড়েছে সমুদ্রের জলস্ফীতি, জলের অম্লতা ও লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। ওজোন স্তর পাতলা হওয়া, মরুময়তা বৃদ্ধি, বৈচিত্র্যের বিনাশ এবং পরিবেশের বিপজ্জনক জরাজর্জরতার সমস্যা দেখা দিয়েছে যা সমগ্র মানবজাতিসহ জীবজ মণ্ডলের অস্তিত্বের গভীরতর সংকট এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। আমাদের অনেক প্রতিবেশী বন্ধু আজ চিরতরে পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়েছে। হারণ হারে উদ্ভিদ এবং প্রাণী বিপন্নতার শিকার হয়েছে। আজকে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের চাহিদা বাড়ছে তাই প্রয়োজন মেটাতে মানুষের জন্য বেশি দ্রব্য ও পরিষেবার জোগান দিতে সব দেশেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিবেশ অনেক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধিতে ধনী দেশ আরো ধনী হচ্ছে, আর খবরদারি বাড়ছে গরিব দেশগুলির উপর।

আজ সারা পৃথিবী জুড়ে পরিবেশ রক্ষার তাগিদ মানুষ অনুভব করছে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে। অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষেও প্রাচীনকাল থেকেই পরিবেশ রক্ষার ভাবনা গড়ে উঠেছে। প্রকৃতির প্রতি মানুষের ভালবাসা, সখ্য আমাদের বহুদিনের, অরণ্যচারী মানুষের সঙ্গে বন্যপ্রাণ, বনের পশু-পাখির সম্পর্ক এক গভীর বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষে ধর্মীয় অনুশাসন অনেক ক্ষেত্রে বন-সংরক্ষণ, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সাহায্য করেছে, দেবতার পূজা ইত্যাদির মধ্য থেকে একটা পরিবেশ ভাবনা তৈরি হয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় মানুষের অরণ্য-জীবনে নিজেদের একাত্ম করে রাখত। সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী পরিবেশ সুরক্ষার ভাবনা নিয়ে ১৯৭২ সালে স্টকহোমে রাষ্ট্রসংঘের প্রথম মানব পরিবেশ সংক্রান্ত সম্মেলনে মানব-পরিবেশ প্রসঙ্গে ভূমিকা ও ২৬টি নীতি সংবলিত একটি ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। এই সম্মেলনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়করা অংশগ্রহণ করেছিলেন। স্টকহোমের সম্মেলনের পর ১৯৭৬ সালে সংবিধানে ৪২তম সংশোধনের মাধ্যমে ৪৮-এর ধারা অনুযায়ী 'রাষ্ট্র পরিবেশ' রক্ষা ও উন্নয়নের প্রয়াস এবং বনাঞ্চল ও বন্যপ্রাণী সমেত প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করা ও তার উন্নতিসাধন করা এবং সকল জীবিত প্রাণীর প্রতি সদয় হওয়া প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের কর্তব্য। এই প্রেক্ষিতে ১৯৮০-তে ভারত সরকার আলাদা একটি পরিবেশ বিভাগ দপ্তর চালু করে।

আজকের পরিবেশ চেতনার পুরোধা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাঁর অসংখ্য গানে, কবিতা, গল্প, সাহিত্যে সর্বত্রই পরিবেশের ছোঁয়া। সারা পৃথিবী ব্যাপী পরিবেশের আসন্ন বিপর্যয়-এর দর্শন ও কার্যকরণ সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। তাঁরই সামগ্রিক প্রকাশ শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতন। এখানে রবীন্দ্রনাথের সব কাজই ছিল পরিবেশ বান্ধব। আজকে যাঁরা ভারতবর্ষে পরিবেশ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আন্দোলনের শরিক হয়েছেন, তাঁরা সকলেই রবীন্দ্রনাথের থেকে প্রেরণা পেয়েছেন।

পরিবেশ আন্দোলনে প্রথমেই যাঁর নাম স্মরণ করতে হয়, তিনি হলেন রাসেল কারসন। বিশ্বজুড়ে 'পরিবেশবাদের জননী' রূপে রাসেল কারসন আজ বন্দিত। তাঁর লেখা 'সাইলেন্ট স্প্রিং' বিশ্বের তামাম পাঠকের সমাদর ধন্য। এই বইটির ভাবনা ও বক্তব্য থেকে গড়ে উঠেছিল বিশ্ব পরিবেশ ভাবনা ও পরিবেশ আন্দোলন। বিশ্বভাবনায় পরিবেশ চেতনা জুড়ে দেওয়াটাই ছিল এই বিষয়ে তাঁর পথিকৃৎ কাজ। রাসায়নিক সার এবং কীটনাশকের চরম সর্বনাশা ব্যবহারে কীভাবে পশু, পাখি, বন্যপোকা এবং অন্যান্য কীটপতঙ্গ সহ সমগ্র বাস্তুতন্ত্র এবং পরিবেশ বিপন্ন সেই কাহিনী এতে লেখা আছে।

রবীন্দ্র স্নেহধন্যা মৈত্রেয়ী দেবী এবং গৌরী আইয়ুব আজীবন নিজেদের জড়িয়ে রেখেছিলেন প্রকৃতি ও পরিবেশ সুরক্ষার আন্দোলনে। গড়ে তুলেছেন মধ্যগ্রামের বাদুড়ে "খেলাঘর"।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি 'স্টকহোম' বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলনে (১৯৭২) উপস্থিত থেকে ভাষণ দিয়েছেন। পরবর্তী সময়কালে ভারতের বাঘ সংরক্ষণে বিশেষ জাতীয় প্রকল্প রচনা করে উল্লেখযোগ্য প্রয়াস গড়ে তোলেন। সামগ্রিকভাবে বন্যপ্রাণী সুরক্ষা ও ন্যাশনাল পার্ক গড়ে তোলায় তাঁর প্রভূত উদ্যম ছিল। বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে তিনি নতুন আইনও প্রবর্তন করেন।

শ্রীমতী মানেকা গান্ধি বন ও পরিবেশ মন্ত্রী থাকাকালীন এ বিষয়ে

এর পর ছয়ের পাতায়

পাঁচের পাতার পর

সাড়া ফেলেছিলেন। বন রক্ষায় নানাবিধ শিথিলতার বিরুদ্ধে তিনি সাড়া ফেলেছিলেন। তাঁর সময়কালে বিপুল পরিমাণে বে-আইনি পশুচামড়া ও পশুদের দেহাবশেষ বাজেয়াপ্ত করে পুড়িয়ে ফেলা হয়। সার্কাসে বাঘ, ভালুক, হাতি, সিংহ প্রভৃতি বন্য জন্তুর ব্যবহার তিনি নিষিদ্ধ করেন। পরিবেশ মন্ত্রী হিসাবে তিনি বেআইনি শিল্পস্থাপনের ও কারখানার জন্য জমি দখল লড়াই অনেকটা বন্ধ করতেও সক্ষম হয়েছিলেন।

মেধা পাটকর প্রায় দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের নেত্রী হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন। মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও রাজস্থান এই চার রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নর্মদা নদী যুগ যুগ ধরে মানুষের ও পরিবেশের প্রধান ধাত্রী হিসাবে তার কল্যাণময় পরশ অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। বাঁধ দিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি ও কৃষির জন্য জলসেচের ৬০,০০০ কোটি টাকার প্রকল্প ১০ লক্ষ আদিবাসী মানুষের জীবন ও কৃষি প্রয়াসকে ধ্বংসেই শুধু করেনি, এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের পরিবেশ বিনষ্টের মূল কারণও। এই ঘটনার বিরুদ্ধে তিনি আজও লড়ছেন আদিবাসী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে।

স্বভাব প্রতিবাদী শ্যামলী খাস্তগীর পরমাণু গবেষণার ক্ষতিকর প্রয়োগের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল লড়াই করে চলেছেন। ভারতের নানা প্রান্তে পরমাণু বিকিরণের ক্ষতিকর প্রভাবে আক্রান্ত গরিব মানুষদের মধ্যে কাজ করেন।

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম জেলার আদিবাসী সমাজের কল্যাণ কামনায়, তাদের অরণ্যের অধিকার রক্ষায় মহাশ্বেতা দেবীর অবদান উল্লেখযোগ্য। বিস্তর লেখালেখির পাশাপাশি সংগঠিত করেছেন পরিবেশ আন্দোলনকে। নদী বাঁচাও আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি যুক্ত।

বীণা কাঞ্জিলাল সুন্দরবনের রাঙাবেলিয়া অঞ্চলে জল-জঙ্গল-বন নিয়ে কাজ করেছেন। পান্নালাল দাশগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল্ ডেভেলপমেন্টের সাথে তিনি আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন।

বিশিষ্ট লেখিকা অরুন্ধতী রায় অসম্ভব প্রতিবাদী। মেধা পাটকারের নর্মদা বাঁচানোর লড়াইয়ে তিনি যুক্ত হন।

জয়া মিত্র জল, জঙ্গল, আদিবাসীদের জীবন সঙ্কট, মণিপুরে গণতন্ত্রের সংগ্রাম ও লোকতাক হ্রদ রক্ষা, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন – –এমন অনেক বিষয়ে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন।

বিশিষ্ট ইকোলজিস্ট বন্দন শিবা-র বিভিন্ন প্রকারের দেশীয় প্রজাতির বীজ সংরক্ষণ করা এক উল্লেখযোগ্য কাজ।

ডাঃ কুসুমা এবং ডাঃ সংঘমিত্রা গাডেকর (দেশাই)-এর শান্তিনিকেতনের গ্রামে গ্রামে দরিদ্র মানুষের চিকিৎসা ছাড়াও পারমাণবিক চুল্লির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

তহমিনা খাতুন জল-জঙ্গল-নদী বাঁচাও, ইট ভাটার আগ্রাসন থেকে উর্বর জমি বাঁচাও, সবুজ-সুরক্ষা আন্দোলনে, ইচ্ছামতী, সুন্দরবন বাঁচাও প্রয়াসে বহু ধরনের আন্দোলন সংগঠিত করেছেন। লিখেছেন প্রচুর। 'বন্যা-২০০০' এর একটি মুল্যায়ন সংকলন প্রকাশ।

বৃক্ষ রক্ষার এক মহান সংগ্রাম ও সংকল্পে যুগযুগ ধরে ভারতের সুবিস্তৃত অরণ্য সমাজকে রক্ষা করেছে, সমৃদ্ধ করেছে রাজস্থানের বিশনয় সম্প্রদায়-এর মহিলারা। এই প্রসঙ্গে অমৃতা দেবীর নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯৮০-র দশকে উত্তর প্রদেশের সরকার হিমালয়ের কিছু অঞ্চলের গাছ কাঠ ব্যবসায়ীদের কাছে নিলাজ করে। কাঠুরিয়ারা গাছ কাটতে এলে এলাকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা প্রথমে বোঝাল, যখন কাজ হল না, তখন প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলল। আদিবাসী মহিলারা গাছ জড়িয়ে ধরলেন। ফলে ব্যবসায়ীরা তাদের উপর নগ্ন আক্রমণের থাঁড়া নামিয়ে আনে। প্রথম দিন চারজন আদিবাসী মহিলা নিহত হন। শেষে সুন্দরলাল বহুগুণার নেতৃত্বে এই আন্দোলন হিমালয়ের বিস্তৃত প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। গাছ কাটা বন্ধ হয়। অরণ্য সুরক্ষার প্রয়াস জোরদার হয়। এটি চিপকো আন্দোলন নামে খ্যাত।

এঁরা ছাড়াও সমগ্র ভারতবর্ষে আরও অনেক মহিলা পরিবেশ প্রেমী এবং কর্মী আছেন যারা নীরবে এবং সরবে 'পরিবেশ বাঁচাও' আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের অধিকাংশের খবর আমাদের কাছে পৌঁছায় না।

আমাদের প্রকাশিত বই

১. ল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (১৯৯২)।
২. দ্য ইগনোরড্ এনভায়রনমেন্ট, উপেক্ষিত পরিবেশ (১৯৯৮)।
৩. রণনীতি ও রণকৌশলের ইতিহাস (২০০৫)।
৪. অধ্যাপক প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী : ফিরে দেখা (২০০৬)।
৫. পরিবেশ (২০০৬)।
৬. ধূসর বসুধা (২০০৬)।
৭. এনভায়রনমেন্টাল অ্যাওয়েকনিং (২০০৬)।
৮. এত আঁধার কেন (২০০৮)।
৯. প্রসঙ্গ : যুদ্ধ ও পরিবেশ (২০০৮)।
১০. প্রসঙ্গ : মানবাধিকার ও পরিবেশ (২০০৮)।
১১. শিক্ষকের সন্ধানে: হুগলি জেলা (২০০৯)।
১২. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ফিরে দেখা (২০০৯)
১৩. জলবায়ু পরিবর্তন : এক অশনি সংকেত (২০০৯)।
১৪. সবুজ বিশ্বের শান্তির অধিকার (২০১০)।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক : পরিবেশ আকাদেমি, সবুজের অভিযান, বড়বাজার, চন্দননগর - ৭১২১৩৬। সম্পাদক : রাহুল রায়।
যোগাযোগ : ৯৪৩৩৫৭৫০৬৪; ৯৮৩৬৫০৮০০৩ ই-মেল : rayrahul2263@yahoo.co.in